X) আরোহণ অথবা বিবর্তন (Ascent or Evolution):

শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বিবর্তনের প্রাক অবস্থা 'কুণ্ডলীকরণ' (involution)। বস্তুতঃ বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরণ ইতিমধ্যেই ঘটেছে। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ এবং মনে অবরোহণ (discent) করেছে তারপর আবার আরোহণ করবে উচ্চ স্তরে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ,

Scanned by CamScanner

জড়ের মধ্যে সুপ্ত আছে, প্রাণ, মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। কারণ প্রাণের মধ্যে মন সুপ্ত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের মতে, শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণিত 'বিবর্তন' একটি বিশিষ্ট চরিত্রের যার সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাবিদদের বিবর্তন ভাবনার কোন মিল নেই। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথা বলেন, কেউ বা আবার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনের কথা বলেন। পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তন বলে, বিবর্তন হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম-বেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। এর বিপরীত তত্ত্ব উন্মেষমূলক বিবর্তন। সেখানে বিশ্বাস করা হয়, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছু উদ্ভব হয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে, পূর্ববর্তী শর্তের ভিত্তিতে আর উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদে বলা হয় বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব হল 'অখণ্ড বিবর্তনবাদ' (Intergral Evolution)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতিতে। এগুলি হল প্রশস্তকরণ (widening), উন্নতিবিধান করা (leightening) এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ (integration), এই পদ্ধতিতে কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় না। সব কিছুকেই পরিণামে অখণ্ডভাবে যুক্ত করা হয়। প্রশস্তকরণ পদ্ধতির অর্থ হল নতুন তত্ত্বের জন্য আরো সুযোগ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি উন্নতিবিধান করার অর্থ এক ধাপ থেকে আর এক উন্নত ধাপে আরোহণ। কিন্তু বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল অখণ্ডতা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের দুটি ধারা। একটি হল জন্মচক্রের মাধ্যমে বাহ্য শরীরের উন্নতি, অন্যটি অন্তঃস্থ পুরুষের ক্রমবিকাশ। ক্রমবর্ধমন চেতনার জন্য শরীরেরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। একদিকে চেতনার উন্নতি হচ্ছে, অন্যদিকে তার উপযোগী শরীরের বা আধারের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই পরিণামে জড় হয়ে উঠবে পরম চিৎপুরুষের পূর্ণ অভিব্যক্তির যোগ্য বাহন।

তাঁর বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উঠেছে। সেগুলি এই রকম:

১) বলা হয় যে চেতনার সপ্ত পর্যায়। জড়ের মধ্যে চিৎপুরুষের অধিষ্ঠান এবং সেখান থেকে এর পুনরুত্থান, জীবের পুনর্জন্ম প্রভৃতিস্বীকার করলেও, জীবের উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আর সচ্চিদানন্দ সৃষ্টি করেছেন আনন্দের জন্য, লীলার জন্য। নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে না, কেননা তাঁর কোন অভাব নেই। তাই বিবর্তনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২) শ্রীঅরবিন্দ যেমন মনে করেন, সেইরকম জড়ের পরে প্রাণের এবং প্রাণের পরে মনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মনের পর যে অতিমানসের আবির্ভাব হবেই - তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, এই জন্যই যে, মন অপরার্ধের শক্তি, অথচ অতিমানস পরার্ধের শক্তি। অতিমানস উচ্চস্তরের শক্তি হয়ে কেন এবং কিভাবে নিম্নস্তরে মনের মধ্যে নেমে আসবে?

৩) আধুনিক বিজ্ঞান যদিও বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই কথাই যে চরম সত্য এমন বলা যায় না, কারণ এমন অনেক বিষয় আছে, যাকে বিজ্ঞান এককালে সত্য বলতো, কিন্তু বর্তমানে তাদের মিথ্যা বলছে।

৪) জগতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশীল জীবের স্বধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। মানুষেরও নিজের 'স্ব-ধর্ম' আছে। স্বধর্মের মধ্যে মানুষ উন্নতি করতে পারে। কিন্তু স্বধর্মকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে

Scanned by CamScanner

অসম্ভব। অতিমানব হয়ে দেবত্ব লাভ করা যেহেতু তার স্বভাব বিরুদ্ধ—তাই অসম্ভব।

এই আপত্তিগুলির উত্তর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে দিয়েছেন এভাবে: প্রথম আপত্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টির পেছনে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই—কেবল এক অচেতন শক্তির ক্রিয়া এই জগৎ। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, সৃষ্টির প্রতি বিষয়ের মধ্যে এতো জটিল ও সুনিপুণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা রয়েছে, যাকে আকস্মিক সমাবেশের ফল বলা যায় না। গূঢ় চিৎপুরুষের সংকল্পের দ্বারাই কেবল এটি সম্ভব হতে পারে। জগৎ সৃষ্টি শুধু লীলা বা আনন্দের জন্য হলেও এই লীলার একটা উদ্দেশ্য আছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে জগৎ অবিদ্যাময়। সেখানে মনের পর অতিমানসের আবির্ভাব যে হবেই - তার নিশ্চয়তা কি? কারণ উচ্চস্তরের অতিমানস কিভাবে নিম্নস্তরের মধ্যে অবতরণ করবে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জগতের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা নয়। সচ্চিদানন্দ নিজেই নিশ্চেতনার মধ্যে নেমেছেন এবং তাঁর দিব্যজ্ঞান সংকুচিত ও আবৃত হওয়াতেই অবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। নিমজ্জিত দিব্যজ্ঞান আবার ক্রমপ্রকাশিত হয়ে পূর্ণজ্ঞানের পথে চলেছে। মানুষের অবিদ্যা হল নিশ্চেতনা ও দিব্যজ্ঞানের মধ্যবর্তী অবস্থা। এটি দিব্যজ্ঞানের সংকুচিত রূপ ঠিকই, কিন্তু মূলতঃ দিব্যজ্ঞান, মানসচেতনার উর্দ্ধে আরও যেসব চেতনার পর্যায় আছে, তাদের শক্তির প্রভাব মানব চেতনায় আসে মানুষও কখনও কখনও অলৌকিকভাবে এদের কথা জানতে পারে। এই সব শক্তি ও অতিমানসও প্রচ্ছন্নভাবে জগতের মধ্যে সক্রিয় থেকে বিবর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রাণ ও জড়ে যেমন মনের আবির্ভাব হয়েছে, মনেও সেইরকম অতিমানসের আবির্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়—অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় আপত্তি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরুদ্ধে, এই বিষয়টিকেও শ্রী অরবিন্দ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞান বাইরের আকার পরিবর্তনের কথাই শুধু বলে, কিন্তু মূল কথা অন্তর্নিহিত চিৎ-শক্তির ক্রম-প্রকাশ। চেতনার জন্যই আকার সৃষ্টি, আকার চেতনার আধারমাত্র। বাইরের দিক থেকে দেখা যায় যে ধীরে ধীরে বিষয়সমূহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং আকার যতই উন্নত, জটিল ও সুগঠিত হচ্ছে, ততই উন্নততর চেতনার আবির্ভাব হচ্ছে। এর কারণ হতে পারে যে দিব্য চিৎ-শক্তি পর পর নূতন আকার ও নূতন চেতনা সৃষ্টি করে চলেছে, কিম্বা পূর্বের বিষয় থেকেই পরের বিষয়ের আকার ও চেতনা গূঢ়ভাবে গঠন করছে, যেমন জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে মন এসেছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আকস্মিকভাবে নয়, বিষয়সমূহের চেতনা ও আকার ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, নিম্ন প্রাণীচেতনা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যখন উচ্চ প্রাণীচেতনায় উপনীত হয় - তখন এটি অনেক দিক থেকেই মানব চেতনার অনুরূপ। সেই পর্যায় থেকে মানব চেতনা ও তদুপযোগী দেহের আবির্ভাব হয়েছে। এই তথ্যই সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

চতুর্থ আপত্তির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, একথা সত্য যে বিষয়সমূহ আপন আপন জাতির ধর্ম পালন করে মানুষও স্বধর্ম পালন করবে। কিন্তু অন্য সব থেকে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে সে সর্বদাই চায় নিজের গণ্ডী অতিক্রম করতে — এটাই তার প্রকৃত স্বধর্ম। মানুষের স্বভাব হল নিম্ন থেকে উচ্চে আরোহণের আস্পৃহা। একথা ঠিক যে মানবজাতির অগ্রগতি একটানা হয়নি, সে কখনও ওপরে উঠেছে, কখনও নিচে নেমেছে। কিন্তু মানষ তার শক্তিকে আরও তীক্ষ্ণ ও



Scanned by CamScanner

সাবলীল করে নূতন নূতন বিষয়ে প্রয়োগ করেছে। চিন্তা ও ভাবের উৎকর্ষে সে হয়তো মহান পূর্বসূরীদের সব সময় অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা সে প্রাচীন যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়ে নানা ভাবনার অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন তত্ত্বে আমরা দেখতে পাই যেমন মহাজাগতিক বিবর্তন তেমনি ব্যক্তির বিবর্তন। বিবর্তন, তাঁর মতে, যেমন জাগতিক, তেমনি ব্যক্তির হবেই। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিই হল আধার, যার মাধ্যমে চিৎশক্তি তার সত্তাকে প্রকাশ করবে। সুতরাং ব্যক্তির আরোহণ কেবল প্রতীকী নয় বরং তা জাগতিক বিবর্তনকে সাহায্য করে, দ্রুত করে। এটাই শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড বিবর্তনের মূলকথা।

Scanned by CamScanner

## অতিমানস (Supermind):

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, অতিমানস স্তর স্বতঃই সত্যের অধিকারী। এর জ্ঞান সত্যের জ্ঞান— কেবল মানসিক জ্ঞানের মতো ছবি বা চিহ্ন নয়। সাধারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, যাদের মধ্য দিয়ে অতিমানস, সাধারণ মনে নেমে আসতে পারে এবং সাধারণ মনও ক্রমশ অতিমানসের উচ্চস্তরে আরোহণ করতে পারে। এটাই বিবর্তনের নিয়ম। সাধারণ চেতনার উর্দ্ধে উচ্চতর মানসিক চেতনার যে স্তর আছে তা মাঝে মাঝেই সাধারণ চেতনাতে বোঝা যায়। কোনো একটি সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করলে মনে হয় হঠাৎ কোথা থেকে সমাধানের চিন্তাটা এসে পড়লো। সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাদের কোনো বিষয় বুঝতে অনেক সময় লাগে বা কষ্ট করতে হয়। আবার কেউ কেউ আছেন, ঐ একই বিষয় খুব দ্রুত বুঝে আয়ত্ত করে ফেলেন। ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষীপ্রতা ও স্বচ্ছতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। কবি বা গূঢ়বাদীর অনুভূতি অতি উচ্চস্তরের চেতনা। এইসব উচ্চ চেতনার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি হতে হলে প্রথমে বাহ্য চেতনা থেকে সরে এসে অর্ন্তমুখী হয়ে আমাদের গূঢ় চৈত্য পুরুষ, আন্তর মন, আন্তর প্রাণ ও আন্তর সূক্ষ্ম শরীরের সন্ধান পেতে হবে।

প্রখরতার তারতম্য হেতু স্তরগুলি উচ্চ বা নিম্ন। সাধারণ মানস চেতনার উর্দ্ধে আছে 'উত্তর মানস' (Higher mind)। এতে সাধারণ মনের মতো সত্যের অন্বেষণ করতে হয় না। এই স্তরের চিন্তার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে ব্যক্তি। এই অবস্থাকে বলা হয় দিব্য-মনন বা সত্য চিন্তন। কিন্তু এর চেয়ে আরো দীপ্ত চেতনা হল 'দীপ্ত মন' বা 'প্রবুদ্ধ

Scanned by CamScanner

মানস'-যাকে 'Illumined Mind' বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই স্তরের শক্তি ও প্রখরতা অনেক বেশি। এই স্তরকে বলা হয় সত্য ও প্রাণ। বৈদিক ঋষিদের নিকট 'সূর্য' সত্যের প্রতিমূর্তি। সেইভাবে বলা যায়, উত্তর মানস স্থির সূর্যালোক এবং দীপ্ত বা প্রবুদ্ধ মানুষের ঊর্দ্ধে জলন্ত সূর্য সত্তার পুঞ্জিভূত রশ্মিরাশি।

এই স্তরের ঊর্দ্ধে সত্যশক্তির আরও মহত্তর শক্তি আছে। একে বলা হয় বোধি বা প্রজ্ঞা। যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "Intuition"। এই বোধই হল নিবিড় ও নির্ভুল সত্যদৃষ্টি, সত্যচিন্তন, সত্য অনুভূতি ও সত্যক্রিয়া। প্রজ্ঞা বা বোধির উৎসস্থলে আছে 'অধিমানস' (Overmind)- যা অতিমানস ঋত্ চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই স্তরেও অধিমানসের 'হিরণ্ময় পাত্র' দ্বারা ঋত্ চেতনার মুখ আচ্ছাদিত থাকে। অধিমানস পরার্ধ ও অপরার্ধের সংযোগসূত্র এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যার মধ্যে অতিমানস চেতনার প্রতিভূ।

অতিমানসের চেতনা অখণ্ড, এতে বিষয় সমূহের মূল সত্য, সমগ্র সত্য এবং প্রতিব্যষ্টিরূপের সত্য একক, এক অবিভাজ্য ঐক্যের সূত্রে গঠিত। কিন্তু অধিমানসের অখণ্ডতা নেই। এর মূল সত্য, সমগ্র ও ব্যষ্টি সত্য। এমনকি এদের একত্ব সম্বন্ধও অবগত। কিন্তু এতে নেই অবিভাজ্য চেতনা। অধিমানসের একান্ত জ্ঞান এবং কেন্দ্রীভূত স্থায়ী চেতনা নয় বা এর কার্যাবলীরও ভিত্তি নয়। এখানে এক একটি শক্তি বা দিক পৃথকভাবে নিয়ে, সেই জ্ঞানকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকশিত করে।

অতিমানস চেতনায় পুরুষ ও প্রকৃতি, চিদ্ ও শক্তি — একই সমগ্র সত্য। কিন্তু অধিমানস চেতনায় এরা পৃথক। এক সমগ্র বহুমুখী সত্তা, বহুদিকে ভাগ হয়ে এক একটি ভাগ, নিজের নিজের ধারা অনুযায়ী বিকশিত হয়। একই চেতনা লক্ষ ধারায় খণ্ডিত হয় এবং প্রতিধারা নিজের নিজের স্বার্থকতার সন্ধান করে। এইভাবে অধিমানস এক সচ্চিদানন্দকে অনন্ত সম্ভাবনার রূপ দেয়। যাতে অনন্ত জগত সৃষ্টি হতে পারে।

এই অতিমানসিক স্তরে সব বিজ্ঞানময় পুরুষ যে একই ধরণের হবে-এমন নয়। সকল বৈচিত্র্যের মূলে এক — এই সত্যই অতিমানসের সত্য।

সুতরাং অতিমানসিক জীব বিভিন্ন হলেও একাত্ম বজায় রাখবে। চেতনার প্রতি কেন্দ্রে, প্রাণের প্রতি স্পন্দনে, দেহের প্রতি কোষে সে অনুভব করবে ভগবৎ উপস্থিতি। তার কাছে সকল জীবই নিজের আত্মা। সে একাধারে ভগবানের ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং বিশ্বাতীত রূপ। নিজে থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে তাঁর চেতনা, সংকল্প এবং কার্যের সংগতি থাকবে।

অনুন্নত জীবের বাহ্য ও আন্তর জীবনে বিরোধ থাকে এবং সে মনে করে জগত বা সংসার তার উন্নতির বাধা স্বরূপ। কিন্তু অতিমানসিক স্তরে যে অতিমানসিক জীবের উদ্ভব হবে, তার কাছে এসব বাধা থাকে না, কেননা জীব ও জগত উভয়েই বিশ্বাতীত ভগবানের বিকাশ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই।

আমাদের অবিদ্যাই বিরোধের মূল কারণ। অহং বশে আমরা নিজেরা জীবনের মূল দাবি মেটাতে চাই, কিন্তু অতিমানসিক স্তরে জীবের অহংবোধ নেই। 'অবিদ্যা বহির্ভূত ঋতম্ জ্যোতির শক্তিতে সে শক্তিমান। সে যেমন নিজের মধ্যে চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের আনন্দ উপলব্ধি করবে, তেমনি সকলের মধ্যে চাইবে ভগবানের আনন্দ। ক্ষুদ্র আশা বা কামনা, তাদের তৃপ্তি বা ব্যর্থতার স্থান অতিমানসিক স্তরে নেই।

Scanned by CamScanner

অতিমানসিক জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব নেই। সুতরাং সেখানে নীতির প্রশ্ন নেই। তাঁর কার্য ও জীবন - তাঁর নিজেরই প্রকাশ। অবিদ্যা ও অহং না থাকলে কোন মিথ্যাচারণ ব অন্যায় ব্যবহার সম্ভব নয়। অবিদ্যাময় মানসিক জীবনে সত্য অজানা — তাই এ স্তরে সত্য সন্ধান করতে হয়। কিন্তু দিব্য জ্ঞানময় অতিমানসিক স্তরে কেবল সত্যেরই প্রকাশ। সত্য কি তা জীব উপলব্ধি করে এবং পরা প্রকৃতির ইচ্ছাই তার কার্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন আসতে পারে, সেটি হল অতিমানসের আবির্ভাব ও এর উচ্চস্তরে আরোহণের অর্থ কি এই নয় যে নিশ্চেতনা থেকে ক্রমোন্নতির আগে বা পরে, পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া? অতিমানসের পরের স্তর সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করেন, এটি চক্রাকারে বিবর্তন। তাই জীব যে চক্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, সেই চক্রেই পুনরায় আরোহণ - তার চরম পরিণতি বলে তিনি মনে করেন। অতিমানস স্তরের প্রভাবে জীবের সমস্তরকম বিরোধের স্থলে আসবে কেবল সামঞ্জস্য - শ্রীঅরবিন্দ একথাই বিশ্বাস করতেন।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে মনোবিজ্ঞানে বিংশশতাব্দীর চিন্তাবিদ্‌দের উপলব্ধিও সহায়ক — বিশেষ করে গেষ্টাল্ট মতবাদীদের শিক্ষাতত্ত্ব। সেখানে বলা হয়েছে— শিক্ষা একান্তভাবেই স্বজ্ঞাজাত এক অন্তর্দর্শন মাত্র। যদিও আপাতদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে এই তত্ত্বের কোন সরাসরি সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু একটা মৌলিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাহল - শিক্ষা নেহাতই যান্ত্রিক 'চেষ্টা ও ভুল সংশোধন' (Trial and Error) মাত্র নয়। এটি 'সহজাত অন্তর উদ্ভাবন' (Insight Flash)। অতিমানসের আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ এই অন্তরের উদ্ভাসিত অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে মনে হয়।

## অতিমানসের ত্রিপাদ (The Triple Status of Supermind):

অতিমানসের তিনটি পাদ। প্রথম হল 'অদ্বয় ঐক্য'। এই অদ্বয় ঐক্য কিন্তু সচ্চিদানন্দের পরম অবস্থার ঐক্য নয়। পরম অবস্থায় সচ্চিদানন্দ দেশকালাতীত স্বরূপে একীভূত। অতিমানসের প্রথম পাদের ঐক্য সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা সর্বময় সমভাবাপন্ন আত্মবিস্তার, তবে এক বহু নয়। আমাদের মানস চিন্তাধারার প্রতীতিগুলি যেমন বহু হয়েও একই চিন্তা, সেরূপ বহুভাবে এই আত্মবিস্তার এক দিব্য অনন্ত প্রতীতি। এখানে চিৎ ও শক্তির মধ্যে কোন ছেদ্ নেই।

দ্বিতীয় পাদে এই ঐক্য কিছু প্রসারিত হয়, যাতে একের মধ্যে বহু ও বহুর মধ্যে একের প্রকাশ সম্ভব হয়। এই পাদে অতিমানসের দিব্যচেতনা পশ্চাতে সরে প্রতি নামরূপে পুরুষ অর্থাৎ চিদ্ আত্মাভাবে সমাহিত হয়। এক পরম পুরুষ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন পুরুষ হন। এই পরম পুরুষ পরমাত্মা, আর বিভিন্ন কেন্দ্রের পুরুষ- জীবাত্মা। জীবাত্মা নিজেকে পরম একেরই এক প্রকাশ বলে জানে, আবার এও জানে, যে সে নিজে, অন্য জীবাত্মা ও পরম এক - সবই এক। এ অবস্থায় ঐক্যই মুখ্য, বহু গৌণ।

তৃতীয় পাদে একত্ব বজায় রেখেও বহু প্রধান হতে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায় হয়। পরে মানসিকস্তরে একত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞান হেতু পৃথক অহং এর ভ্রমাত্মক রূপ নেয়। এই পাদে তাই চেতনার ঐক্য গৌণ এবং বহু মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন আনন্দময় দুই পৃথক তত্ত্ব। দ্বিতীয় পাদের চেতনায় পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একাত্মবোধ অটুট থাকে; কিন্তু তৃতীয় পাদের চেতনায় দ্বৈতভাবই প্রবল হয়। একাত্মবোধ দ্বৈতভাবের চরম পরিণতি। অবশ্য এই তৃতীয়

Scanned by CamScanner

পাদে জীবাত্মা নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে না, শান্ত একের সত্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সত্যকেও সমানভাবে স্বীকার করে। বৈচিত্র্য ও একত্ব একই দিব্যলীলার যথাক্রমে ভিত্তি ও শিখর। তবে বৈচিত্র্যের লীলা মুখ্য, বৈচিত্র্যই একত্বের পূর্ণতা আনে।

এই তিনটি পাদ একই সত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি মাত্র অর্থাৎ দিব্যলীলা আস্বাদনের বিভিন্ন উপায়। উপনিষদে যে বলা হয়—'একই বহু হয়েছেন'— তাতে এ তিনটি পাদেরই সত্য উপলব্ধি স্বীকৃত হয়। এখানে আমরা বলতে পারি প্রথম পাদ 'কারণ অবস্থা'। যেখানে সবকিছু অতিমানসের সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত। দ্বিতীয় পাদ প্রথম পাদের অব্যবহতি ফল, 'কার্য অবস্থা'— যেখানে ক্রীড়া শুরু হয়। তৃতীয় পাদ হল 'পূর্ণ-ব্যক্ত-অবস্থা'—যেখানে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় হয় এবং চেতনা সমস্ত আকৃতি ও কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

সুতরাং এই তিন প্রকার উপলব্ধিই সত্য। পরম এক অনির্বচনীয়, আমদের মানসিক প্রতীতির এক ও বহুর অতীত। একই বহুভাবে প্রকাশের ভিত্তি, আর বহু একেরই প্রকাশ ও দিব্য প্রকাশের মধ্যে ঐক্য আস্বাদনের উপায়।

**ত্রিবিধ রূপান্তর (The Triple Transformation):**

প্রকৃতির অবিদ্যাময় রূপ ছদ্মবেশ মাত্র। স্বরূপতঃ এটি ভগবানেরই আনন্দময় চিৎশক্তি। প্রকৃতির অমূল ও পূর্ণ রূপান্তরই বিবর্তনের লক্ষ্য। কিন্তু কেবল কয়েকজন ব্যক্তি-আত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান পেয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রকৃতির উদ্দেশ্য সফল হয় না। এজন্য আবশ্যক পৃথিবীতে এক নতুন সৃষ্টি। মন যেমন আমাদের সহজাত সম্পদ, সেইরকম অতিমানস সত্তা হবে এই নতুন সৃষ্টির সহজাত সম্পদ। এর জন্য প্রয়োজন মানবাত্মার ত্রিবিধ রূপান্তরের - এটাই শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস।

এই ত্রিবিধ রূপান্তরের প্রথমে হওয়া প্রয়োজন চৈত্য রূপান্তর। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সমগ্র প্রকৃতিকে পরিণত করতে হবে চৈত্য পুরুষের যন্ত্র রূপে। দ্বিতীয় রূপান্তর হল **আধ্যাত্ম রূপান্তর**। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে, এমনকি আমাদের প্রাণ, দেহ ও অবচেতনার অন্ধকারের মধ্যেও উচ্চর জ্যোতি, আনন্দ, জ্ঞান, শক্তি ও শুদ্ধতার অবতরণ ঘটাতে হবে। তৃতীয় রূপান্তর অর্থাৎ রূপান্তরের চরম স্তর হল **অতি-মানসিক রূপান্তর**। এই অতি মানস স্তরে আরোহণ করলে আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতি অতি-মানসিক জীবে পরিণত হয়।

প্রথম পরিবর্তন অর্থাৎ চৈত্য পুরুষের উন্মেষ, যদিও বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তবু এটাই জীবের শাশ্বত সত্তা। হৃদয়ের অন্তরতম গুহায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রচ্ছন্ন জ্যোতি আমাদের সত্য পথে চলার নির্দেশ দেয়। আমরা এর কথা জানিনা বলেই ভাবি এটি আমাদের মনের নির্দেশ এবং অবস্থা ভেদে এই নির্দেশকে মান্য কিম্বা অমান্য করি। মানুষের দেহ এবং প্রাণের দাবী যতদিন প্রবল থাকে ততদিন চৈত্য পুরুষের সম্বন্ধে তার কোন চেতনা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থাটাকে বলতে চান মানুষের দেহাশ্রয়ী ইন্দ্রিয় ও জৈবিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ থেকে ক্রমে চৈতন্যের জীবনে রূপান্তর।

কিন্তু চৈত্য পুরুষের অধি-চেতনা থেকে ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তারিত হতে থাকে। ফলে জীবনের ক্রমগতির সঙ্গে আমরা কখনও কখনও আমাদের মধ্যে দেহ, প্রাণ ও মনের অতিরিক্ত একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি। অবশ্যই আমাদের দেহ, প্রাণ ও মনের কলুষিত ভাবের দ্বারা এই 'অতিরিক্ত কিছু' - যা আমাদের নির্দেশ দেয়, সেটি বিকৃত হয়ে যায়, ফলে এর শক্তিও দুর্বল

Scanned by CamScanner

হয়ে পড়ে; প্রথম অবস্থায় আমাদের পক্ষে চৈত্য পুরুষের উপলব্ধি দুরূহ। যদিও চিৎপুরুষ এক কিন্তু প্রকৃতির গঠন ভেদে এর গঠন বিভিন্ন হয়।

আমাদের চেতনা গভীর অন্তর্মুখীন হলে মন-আত্মা, প্রাণ-আত্মা ও শরীর-আত্মার কথা জানতে পারি। তাছাড়া আমরা জানতে পারি আমাদের ভিতরের অন্নময় পুরুষকে। প্রাণময় পুরুষকে ও মনোময় পুরুষকে। এইসব পুরুষ যা আমাদের আত্মার অংশ, সেগুলি আত্মার প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু এদের তৈরী মানসিক, শারীরিক ব্যক্তিত্ব আমাদের চৈত্য ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। এদের প্রত্যেকেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র্য। কাজের জন্য একটা গোঁজামিল আনা হয়। আসলে কিন্তু অমিল থেকেই যায়। তাই দেখা যায় একই ব্যক্তির মধ্যে নানা ব্যক্তি আছে। কারুর অন্নময় সত্তা, কারো বা প্রাণময় সত্তা, আবার অন্য কারো মনোময় সত্তা প্রবল। যার অন্নময় সত্তা প্রবল - সে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়েই ব্যস্ত। সাধারণতঃ অন্য কোন চিন্তা তার নেই। যার প্রাণময় সত্তা প্রবল - সে চঞ্চল, কর্মঠ ও অশান্ত। যার মনোময় সত্তা প্রবল - মানসিক আদর্শ ও ভাবের প্রতি তার বেশি নিষ্ঠা। সে চায় দেহ ও প্রাণকে তার মনোমত সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে। কিন্তু এরাও কম প্রবল নয়। সেই কারণেই তারা মনের শাসন মানতে চায় না। প্রত্যেকেই চায় নিজের কর্তৃত্ব। এভাবেই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে। যতদিন না চৈত্য পুরুষের ব্যক্তি রূপ দৃঢ় হয়, ততদিন এই অসামঞ্জস্য চলতেই থাকে। এটি শক্তিশালী হলেই অন্ত পুরুষ সম্মুখে এসে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ আসল রাজা রাজ্যের ভার নেয়। তখনই আমাদের সত্তায় ও জীবনে প্রকৃত সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয়।

আবার হৃদয়ের মাধ্যমেও সত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হতে পারে। এর পূর্ণ শক্তি পাওয়া যায়, যখন মন নৈব্যক্তিকতা ছাড়িয়ে পরম ব্যক্তি-পুরুষের উপলব্ধি লাভ করে। যদি আমরা আমাদের অহমাত্মক কামনা ও আসক্তি বর্জন করে ভগবৎ কার্যে নিজেদের সংকল্পকে উৎসর্গ করতে পারি, তবে ভক্তিভাবের সঙ্গে এই উৎসর্গ আমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। আবার মন, হৃদয় ও সংকল্প-এই তিনের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে আমাদের উপরিস্থিত সত্তা ও প্রকৃতিকে এমন এক অবস্থায় আনবে, যাতে আমরা আরও উন্মুক্ত হব আমাদের অন্তস্থ চৈত্য আলোকের দিকে।

কিন্তু পূর্ণ সাফল্যের জন্য বাইরে থেকে অন্তপুরুষের নির্দেশ নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এই কাজ দুরূহ, এর জন্য আবশ্যক বর্হিপ্রকৃতির পরিবর্তন। ধাতু ও শক্তির অচঞ্চলতা, শুদ্ধি ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন।

অন্তর আত্মার প্রবেশের জন্য এক কার্যকরী উপায় হল পুরুষকে প্রকৃতি থেকে পৃথক করা। এতে মন, প্রাণ ও দেহ - এই তিনের ক্রিয়া থেকে সরে এসে নিজের অন্তর-সত্তাকে নীরব, নৈব্যক্তিক আত্মা সাক্ষীপুরুষ রূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এই উপায়ে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও মুক্তি হলেও রূপান্তর যে হবেই তা নয়। পুরুষকে শুধু নীরব সাক্ষী হলে চলবে না, তাকে হতে হবে সকল চিন্তা ও কার্যের জ্ঞাতা উৎস ও অধীশ্বর। এর জন্য হয় চৈত্য পুরুষের নয় অতিচেতনার আশ্রয় প্রয়োজন।

প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য এরপর অতিমানসে ও অতিমানসিক প্রকৃতিতে আরোহণ একান্ত আবশ্যক। কারণ এর অবাধ শক্তি আমাদের সত্তার সমগ্র রূপান্তর সাধনে সক্ষম। তবে উচ্চতর চেতনায় আরোহণই যথেষ্ট নয়। নিম্ন প্রকৃতির মধ্যে এর অবতরণও বিশেষ প্রয়োজন। এই

Scanned by CamScanner

অবতরণের জন্য ব্যক্তির দেহরূপ পাত্রকে সুদৃঢ় করতে হবে। মন ও প্রাণের অহমিকা,মৌল অশুচিতা, নিম্ন আত্মার মিথ্যাচার, কামনা, অজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রভৃতিকে দূর করতে হবে। হৃদয় মন্দির পবিত্র না হলে দিব্য শক্তি ধারণ অসম্ভব। উর্দ্ধের জ্যোতি ও জ্ঞান মনের সমতা ও নীরবতার মধ্যে নেমে এলে উচ্চতর সত্য ও প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে তারা বুদ্ধির বিভ্রান্তিকে দূর করে। ফলে নূতন চেতনার সৃষ্টি ও নূতনভাব গড়ে ওঠে। তখন সর্বত্র পরম পুরুষের শক্তি আমরা অনুভব করি।

এইভাবেই মানসিক চেতনা পরিণত হয় আধ্যাত্মিক চেতনায়। এটাই আধ্যাত্মিক রূপান্তর। চৈত্য রূপান্তরের পূর্ণতার জন্য যেমন আধ্যাত্ম রূপান্তর প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের পূর্ণতার জন্য অতিমানসিক রূপান্তর আবশ্যক। প্রকৃতি এই শক্তির উপযুক্ত হলেই উর্দ্ধের ঋত্ চেতনা নিম্নে অবতরণ করে প্রকৃতির অন্তস্থ অতিমানসিক শক্তির প্রকাশে সহায়ক হবে।

Scanned by CamScanner